কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পাঠ

ভানুদেব দত্ত

প্র কা শ ন

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পাঠ
ভানুদেব দত্ত
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক ২০২৫
প্রচ্ছদ: শৈলী বিভাগ, দ্যু প্রকাশন

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
দ্বিতীয় মুদ্রণ: কার্তিক ১৪৩২, অক্টোবর ২০২৫
প্রথম দ্যু প্রকাশ: ভাদ্র ১৪৩২, সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৪, বহুস্বর, কলকাতা

Communist Manifesto Path
[HOW TO READ *COMMUNIST MANIFESTO*]
By Bhanudeb Dutta
Copyright © Author 2025
Cover Designed by DyuART
First Published by January 2024, Bahuswar, Kolkata
First Dyu Published: September 2025
Second Print: October 2025 by Dyu Publication

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-99650-6-0
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, of by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

আগামী প্রজন্মের
কমিউনিস্টদের হাতে...

কৃতজ্ঞতা

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত বইয়ের অন্যতম হলো *কমিউনিস্ট ইশতেহার*। এটি প্রকাশের ১৭৭ বছর (১৯৪৮–২০২৫) পরেও এই ছোট্ট বইটিকে অন্যতম ভিত্তি ধরে বিশ্বের দেশে দেশে মানবমুক্তির সংগ্রাম অগ্রসর হচ্ছে। মানুষ ও প্রকৃতির মুক্তির জন্য 'সমাজ বিপ্লব' বর্তমান সময়েও আলোচনায় সামনে এসেছে। সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার তত্ত্বকে বিকশিত করেছে *কমিউনিস্ট ইশতেহার*।

কমিউনিস্ট ইশতেহার-য়ে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে, শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজের পতনের অনিবার্যতা। মানব মুক্তির সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী ভূমিকার তত্ত্ব, শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের স্বার্থে বিপ্লবের অনিবার্যতা এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিকতাবাদের সুস্পষ্ট দীপ্ত ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এই পুস্তিকায়। মেহনতি-শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে গভীর সুগ্রথিত যুক্তি ও আন্তরিক আবেগ দিয়ে।

বর্তমান সময়ে গড্ডালিকা প্রবাহে সমসাময়িক জনতুষ্টিবাদী অবস্থানে থেকে অনেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চান। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির জন্য দুনিয়াজোড়া কোটি কোটি শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রাম অগ্রসর করার কোনো বিকল্প নেই। তাই

এ সময় *কমিউনিস্ট ইশতেহার* পুনঃপাঠ আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

কমরেড ভানুদেব দত্তের '*কমিউনিস্ট ইশতেহার* পাঠ' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালে কলকাতা থেকে। তাঁর অনুমতি নিয়ে এদেশে আমরা বইটির বাংলাদেশি সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বইটি প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য শ্রদ্ধেয় লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

৮৯ বছর বয়সেও এখনো তিনি সচল হয়ে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর '*কমিউনিস্ট ইশতেহার* পাঠ' পুস্তিকাটি আমার কাছে *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-র জনপ্রিয় সহজপাঠ বলে মনে হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা—আগামী প্রজন্ম, বিশেষ করে যারা মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত হয়ে পথ খুঁজছেন, ভূমিকা রাখতে চাইছেন, তাদেরকে আকৃষ্ট করে চিন্তার প্রসার ঘটাতে বইটি সহায়ক হবে। আর তরুণ প্রজন্ম-সহ অন্যদেরকেও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার চিরন্তন সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করবে।

দ্যু প্রকাশন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় স্বস্তি পেয়েছি। তরুণ কমরেড মিতা মেহেদী উৎসাহ নিয়ে প্রচ্ছদ করেছেন—তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধন্যবাদসহ
রুহিন হোসেন প্রিন্স
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
পটভূমি	১৫
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র জন্মকথা	২৩
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র চারটি অধ্যায়	৯৪
বিভিন্ন সংস্করণের ভূমিকা	১৬০
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা	১৭৫
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো: উত্তরাধিকার ও প্রাসঙ্গিকতা	১৮০
বাংলায় *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* অনুবাদ	২০৪
উপসংহার	২১৮

ভূমিকা

শ্রমিক, শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের জীবনজীবিকার সংগ্রাম চলেছে সেই সুদূর অতীত থেকে। ফলশ্রুতিতে সমাজ বদলেছে, সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। উৎপাদিকা শক্তির, বিশেষত উৎপাদনযন্ত্রের বা হাতিয়ারের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কের বহিরঙ্গে পরিবর্তন দেখা দিলেও, মূল জায়গা–শোষণ ও বৈষম্যের সম্পর্ক অটুট থেকে যাচ্ছে। শোষণের বিদ্যমান চেহারাটা পালটাচ্ছে, তবে অন্যরূপে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমকালের শোষকদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে। তাই তার বিরুদ্ধে চলেছে অবিরাম সংগ্রাম–শ্রেণিবিরোধ, শ্রেণিসংঘাত ও শ্রেণিসংগ্রাম।

পুঁজিবাদী কাঠামোতে শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা এবং শ্রেণিসংগ্রাম হচ্ছে ইতিহাসের চালিকাশক্তি—এই ধারণার কথা যাঁরা প্রথম বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ-সহ উল্লেখ করেছিলেন, তাঁরা হলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। তাঁরা ১৮৪৮ সালে যৌথভাবে রচনা করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার। সংক্ষেপে পরিচিত *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* বা 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' নামে। তাঁদের আগে কেউই শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকাকে এইভাবে দেখেননি এবং পুঁজিবাদকে উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে

বিশ্লেষণ করেননি। দার্শনিক ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের মন্তব্য ছিল, দার্শনিকরা বিভিন্নভাবে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আসল কথা হল তাকে পরিবর্তন করা। এই পরিবর্তনের রূপকার যে শ্রমিকশ্রেণি, এই কথা দৃঢ়প্রত্যয়ে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁদের রচিত *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*-তে। ব্যঙ্গের সুরেই তাঁরা শুরু করেছেন: 'ইউরোপ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত।' আর শেষ করছেন দৃপ্তভঙ্গিতে: 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।'

এঙ্গেলসের মৃত্যুসংবাদে এক প্রবন্ধে ১৮৯৫ সালে লেনিন *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি বিষয়গুণে বিপুলায়তন গ্রন্থাবলির সমান। এর সারমর্ম সভ্য দুনিয়ার সকল সংগঠিত ও লড়াকু পাঠ প্রলেতারিয়েতকে আজও উদ্দীপ্ত করে এবং পথনির্দেশ দেয়।'[১] এর কারণ হিসাবে লেনিন বলছেন, 'প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতায় ও চমৎকারিত্বে এ রচনায় (*কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*: ভা. দ.) মূর্ত হয়েছে নতুন বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সমাজজীবনের এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সর্বাপেক্ষা সর্বাঙ্গীন ও সুগভীর মতবাদ স্বরূপ দ্বন্দ্ববাদ, শ্রেণিসংগ্রাম এবং নতুন কমিউনিস্ট-সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক ভূমিকার তত্ত্ব।'[২] মার্কস ও এঙ্গেলস এক নতুন মতাদর্শ নিয়ে তৈরি করেছিলেন এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি যার মধ্যে মার্কসবাদকে প্রথম উপস্থিত করা হয় বিশ্ব পুনর্গঠনের একটা সুসমঞ্জস কর্মসূচি হিসাবে।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে সব মানুষ, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণি জানুক তার মূলকথাগুলো–এ-উদ্দেশ্যেই এই বইখানা রচিত হয়েছে। আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। বামপন্থী দল, বিশেষত কমিউনিস্ট দলগুলি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক

দল তাদের প্রভাবাধীন শ্রমিকশ্রেণিকে এসব কথা জানায় না বা বলে না। সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণি হল অগ্রগণ্য শক্তি—এই মূল্য বা মর্যাদা তারা দেয় না। মালিকের কাছ থেকে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কোনোরকমে নিজেদের দাবি আদায় করতে পারলেই তারা খুশি হয়। তাদের আয়ত্তাধীন শ্রমিকশ্রেণিও মনে করে, এটাই হল সব। ভুলে যায়, মালিক হল বুর্জোয়াশ্রেণি আর শ্রমজীবী মানুষেরা হল শ্রমিকশ্রেণি। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটাই হল বৈর।

এই বিষয়টিকে খেয়ালে রেখেই শ্রমিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দলগুলি বুর্জোয়াশ্রেণির অপশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করা এবং তাদের পর্যুদস্ত করার কথাই ঘোষিত হয়েছে 'ম্যানিফেস্টো'-র 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'–এই ঘোষণার মাধ্যমে। ছোটো এই ঘোষণার মধ্যে নিহিত রয়েছে মার্কসীয় দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতির করণীয় সিদ্ধান্ত। একই সঙ্গে এই গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা আরও অনুভূত হয় যখন দেখি, মার্কসবাদ থেকে বিবিধ বিচ্যুতি সমাজতন্ত্রের বিপদ ডেকে এনেছে। এইসব বিবেচনায় আমার *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পাঠ* রচনার প্রয়াস ও প্রকাশ।

টীকা ও তথ্যসূত্র:

১. 'Engles', *Lenin Collected Works (LCW)*, Vol. 2, p. 24.

২. *LCW*, 21, p. 48.

পটভূমি

সামাজিক পটভূমি

অষ্টাদশ শতকের দুটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল ১৭৬০ সালের শিল্প বিপ্লব এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতি। যন্ত্রশিল্প উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়ে আসে এক মৌলিক পরিবর্তন। এটি ছিল শিল্প বিপ্লবের প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান। দ্বিতীয় অবদান ছিল বাষ্পশক্তির ফলে পরিবহনব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি, যার ফলে রেলপথ ও জলপথের বিস্তৃতি ঘটে। তৃতীয় অবদান দেখা দিয়েছিল কৃষিক্ষেত্রে–ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে। এটি সম্ভব হয়েছিল যন্ত্রের প্রয়োগে। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণির উন্মেষ ঘটেছিল। সময়ের অগ্রগতিতে শিল্প বিপ্লবের ব্যাপ্তির ফলে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সমাজজীবনেও পরিবর্তন দেখা দিতে থাকল। গ্রাম ভেঙে শহর গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। কিন্তু ঘটনাবহুল এই অগ্রগতি নিয়ে এল এক স্ববিরোধিতা—একদিকে শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার অগ্রগতির ফলে প্রভূত উন্নতি হতে লাগল, অন্যদিকে বাড়ল শ্রমিকের উপর শোষণের তীব্রতা। একদিকে প্রচুর মুনাফা, অন্যদিকে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ। এটা ছিল সামন্তবাদী অবস্থা থেকে পুঁজিবাদী অবস্থায় উত্তরণের কাল। এই সময়কালে উৎপাদিকা শক্তির বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে।

সামন্তবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত সামগ্রীর উপর প্রত্যক্ষ উৎপাদকের একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। পুঁজিবাদে উত্তরণকালে শ্রম-প্রক্রিয়ার উপর এই নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত হল, বিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক তৈরি হল। পূর্বাবস্থা থেকে এ ছিল এক বিরাট অগ্রগতি, যাকে বলা যেতে পারে Transformation; এবং এর বিপরীত দিকে তৈরি হল সুতীব্র শোষণ। এঙ্গেলস তাঁর *দ্য কন্ডিশন অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড* (১৮৪৫) গ্রন্থে এর মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরেছেন।

রাজনৈতিক পটভূমি

ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) দুটি ধারার প্রথমটি হল বিপ্লবী গণতন্ত্রের ধারা, যা পরিচালিত হয়েছিল জ্যাকোবিনপন্থীদের দ্বারা, এবং অপরটি ছিল জিরোন্দিন-পরিচালিত রক্ষণশীল ধারা। এই বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছিল রক্ষণশীল ধারার জয়লাভের মধ্যে দিয়ে, ফ্রান্সের ক্ষমতা থেকে রাজতন্ত্রীদের উচ্ছেদ করে। অর্থাৎ জিরোন্দিন ক্ষমতায় আসে। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল পতনের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়। এইভাবে শেষ হয় ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্ব। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হলেও, নতুন করে জ্যাকোবিনপন্থী ও জিরোন্দিনপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সামনে আসে। রক্ষণশীল ধারার উদ্দেশ্য ছিল। পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে ফ্রান্সকে ধরে রাখা। এরা ছিল শিল্প ও বাণিজ্য পুঁজি এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের প্রতিনিধি। কিন্তু জ্যাকোবিনপন্থীরা ছিল কৃষক ও শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধি। তারা চাইত রাজতন্ত্রের পূর্ণ উচ্ছেদ। এই বিরোধের পরিণতিতে ১৭৯৩ সালে (৩১ মে–২ জুন) জিরোন্দিনদের পতন ঘটল। জ্যাকোবিনপন্থীরা ক্ষমতায় এল। প্রতিষ্ঠিত হল বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। নেতৃত্বে ছিলেন রোবসপীয়ের, মারাট প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

কিন্তু এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। জ্যাকোবিনপন্থীদের মধ্যে রোবসপীয়ের-বিরোধী একটি

গোষ্ঠীর নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটায় বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটেছিল। এটি ঘটেছিল ১৭৯৪ সালের ২৭ জুলাই। সে-সময় একদিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপের রাষ্ট্রজোটের আক্রমণ, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে ছিল রাজতন্ত্রীদের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র। ফ্রান্সের এইরকম এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রমিকদের উপর চলেছিল মালিকদের নৃশংস অত্যাচার। উপরতলার মানুষদের কাছে শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'একটি বিপজ্জনক শ্রেণি' (Dangerous Class)[১]।

শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমি

শিল্প বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের ফলে শিল্প, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং তার ফলে উৎপাদনের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল, একথা যেমন ঠিক, তেমনি অন্যদিকে মুনাফার স্বার্থে শ্রমিকের দুর্দশা ও অসহনীয় অবস্থা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিবাদ যে-কোনো স্তরে নামতে পারে। *দ্য ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ডে কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়নিস্ট-টি জে ডানিং-বর্ণিত (Thomas Joseph Dunning, ১২ জানুয়ারি ১৭৯৯–২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩) সেই সময়কার অবস্থার উল্লেখ করে একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, 'যেখানে মুনাফা পাওয়া যায় না, বা অল্প মুনাফা পাওয়া যায়, পুঁজি সেখান থেকে দূরে থাকে। ঠিক যেমন আগে বলা হত প্রকৃতি শূন্যস্থানে থাকতে পারে না। পর্যাপ্ত মুনাফার জন্য পুঁজির রয়েছে বেশ সাহস। দশ শতাংশ মুনাফার জন্য যে-কোনো জায়গায় একে নিশ্চিতভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে; বিশ শতাংশের নিশ্চিতির জন্য এর আগ্রহ আরও বাড়বে, পঞ্চাশ শতাংশ একে করে তুলবে উদ্ধত, একশো শতাংশের জন্য পুঁজি সমস্ত মানবিক আইনকে পদদলিত করার জন্য প্রস্তুত থাকে। আর তিনশো শতাংশ তার কাছে কোনো অপরাধই নয় যে, তাকে দ্বিধায় পড়তে হবে...।'

যুগান্তকারী এই দুই ঘটনার জন্য মালিকের শোষণের তীব্রতার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হতে আরম্ভ করে। এই আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে দুভাবে:

১. মেশিনভাঙার আন্দোলন: একদল শ্রমিক সে সময় মনে করত, মেশিনই হল সমস্তরকম দুর্দশার কারণ। এই ধারণার হোতা ছিলেন ব্রিটেনের লাইসেস্টারশায়ার-এর শ্রমিকনেতা জেনারেল নেড লাড (Ned Ludd)। মেশিনভাঙার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তৎসহ চলেছিল আরও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কাজ। যেমন, ১৭৯৯ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারে দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন, ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত রিফর্ম বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৮ সালে চার্টিস্ট আন্দোলন ইত্যাদি। এই বছরগুলিতে লক্ষ-লক্ষ শ্রমিকের স্বাক্ষর-সংবলিত চার্টার পেশ করা হয়েছিল। ১৮৩৯ সালের আন্দোলনে স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছিল বারো লক্ষ শ্রমিকের, দ্বিতীয়বারে (১৮৪২) তেত্রিশ লক্ষ এবং তৃতীয়বারে (১৮৪২) স্বাক্ষর করা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ। শেষবারে স্বাক্ষরযুক্ত কাগজগুলি এত বড়ো ও ভারী ছিল যে, সেগুলি পার্লামেন্ট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়েছিল বিশাল আয়তনের ক্রেটের সাহায্যে, যাকে টেনে নিয়ে গেছিল কুড়িজন মানুষ। এই হচ্ছে ইংল্যান্ডের অবস্থা। এই শ্রমিকেরা ১৮৪০ সালে একটি পার্টি—চার্টিস্ট পার্টি নাম দিয়ে গঠন করার চেষ্টা করেছিল।

২. ফ্রান্সে ১৮০৭-২৩ পর্যন্ত লাড্ডাইট আন্দোলন ভিয়েনা, লিয়ঁ শহরে চললেও, তার তীব্রতা স্তিমিত হয়ে আসছিল। তবে আর-একটু সংগঠিতভাবে আবার আন্দোলন সংঘটিত হল লিয়ঁ শহরে ১৮৩১ সালে

সিল্ক ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকদের দ্বারা। পেশায় এই শ্রমিকেরা ছিলেন তাঁতি—রাস্তায় কালো পতাকা ও ব্যানার নিয়ে মিছিল করেছিলেন তারা। ব্যানারে লেখা থাকত: 'জীবন ও জীবিকার অধিকারের জন্য আমরা মরতেও প্রস্তুত।' মেশিনভাঙার আন্দোলনের চেয়ে এই আন্দোলন সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত হলেও, প্রথমদিকে তা ছিল কমজোরি। তবে এই আন্দোলনই আরও শক্তিলাভ করেছিল ১৮৩৪ সালে। এবারের আন্দোলনটি পূর্বের তুলনায় ছিল আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী। এ কেবল নিজেদের কর্মস্থলের পরিস্থিতি বা দাবি নিয়েই ছিল না, সঙ্গে যুক্ত ছিল দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠারও দাবি। একইরকমভাবে উল্লেখ করা যায়, ১৮৪৪ সালে জার্মানিতে সাইলেসিয়ার তাঁতিদের অভ্যুত্থান। এটা ছিল বুর্জোয়াব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মানির শ্রমিকদের সংগ্রাম। এসব আন্দোলনকে—কি ইংল্যান্ডে, কি ফ্রান্সে—সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দমন করা হয়েছিল। এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, প্রলেতারিয়েতের এইসব বিক্ষোভ ইতিহাসের ধারণার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরিবর্তন।

এইসব আন্দোলনে যতই দমনপীড়ন চলুক-না-কেন, এগুলি ছিল আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি। এইসব আন্দোলনের ব্যর্থতার পিছনে ছিল তিনটি কারণ: সংস্কারপন্থী মতাদর্শ, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াশ্রেণির ভাবাদর্শের প্রভাব এবং গুপ্ত সংগঠনগুলি ছিল জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ চরিত্রগতভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: মতাদর্শহীনতা এবং সংগঠিত পার্টির অনস্তিত্ব।

তাত্ত্বিক মতবাদের পটভূমি

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে শ্রমিকশ্রেণির উন্মেষকালীন পর্বে তাদের জন্য চিন্তা করার কাজ শুরু হয়েছিল। তবে ফরাসি বিপ্লবের পর

অনেকেই শ্রমিকশ্রেণির দুর্দশার মূল কারণগুলি খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদেরকে বলা হত কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী। এঁরা পৃথিবীতে উন্নত জীবনের কথা বলতেন। এঁরা ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। আমরা মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথায় পরে আসব। একে ভালোভাবে বুঝতে হলে এর পূর্ববর্তী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা সম্পর্কে জানা দরকার। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রকে বলা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত এবং এর জন্মদাতা বলে ধরা হয় ইংরেজ মনীষী টমাস মুরকে (Thomas Moore, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৭৮–৬ জুলাই ১৫৩৫)। তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, *ইউটোপিয়া* (১৫১৬), যা থেকেই পরবর্তীকালে ১৬-১৯ শতকের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার এই ধারার নাম হল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। যেমন: ইটালির কাম্পানেলা (Tommaso Campanella, ৫ সেপ্টেম্বর ১৫৬৮–২১ মে ১৬৩৯), ফরাসি গ্রাম্য যাজক মেলিয়ে (১৬৬৪–১৭২৯), চিন্তানায়ক সাঁ সিম (Saint Simon, ১৭ অক্টোবর ১৭৬০–১৯ মে ১৮২৫), ফুরিয়ে (Charles Fourier, ৭ এপ্রিল ১৭৭২–১০ অক্টোবর ১৮৩৭), ইংরেজ চিন্তানায়ক রবার্ট ওয়েন (Robert Owen, ১৪ মে ১৭৭১–১৭ নভেম্বর ১৮৫৮), রুশ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী বেলিনস্কি (Vissarion Belinsky, ১১ জুন ১৮১১–৭ জুন ১৮৪৮), চের্নিশেভস্কি (Nikolay Chernyshevsky, ১২ জুলাই ১৮২৮–২৯ অক্টোবর ১৮৮৯) প্রভৃতি।

এইসব সমাজতন্ত্রীদের মূলকথা ছিল—মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণ নিহিত রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানায়। তাই তাঁরা ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। এইসব সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ-কেউ উৎপাদনের উপকরণের

সামাজিক মালিকানার উপর জোর দিয়েছিলেন। বণ্টনের প্রশ্নে বৈষয়িক সম্পদের বণ্টনের ব্যাপারেও মত দিয়েছিলেন। এইসব সমাজতন্ত্রীদের আর-একটি সুকৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁরা মনে করতেন, সমাজের পুনর্গঠন হতে পারে সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, শিক্ষামূলক প্রচারে।

এইসব সমাজতন্ত্রীরা মজুরি দাসত্বের মর্মার্থ ধরতে পারেননি। পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্বিরোধ এবং তার উৎপাদনব্যবস্থায় নিহিত অভ্যন্তরীণ বিরোধ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁরা। শ্রেণিসংগ্রামের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও, সেটাই যে ইতিহাসের চালিকাশক্তি—একথা বুঝতে অক্ষম ছিলেন তাঁরা। শ্রমিকশ্রেণিকে হতভাগ্য ও নিপীড়িত শ্রেণি হিসাবে মনে করেও তাদের যে একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে, তারা যে এক বৈপ্লবিক শক্তি—একথা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁরা অপারগ ছিলেন। এইসব কারণের জন্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের অনুসারী। লেনিনের কথায়—'ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র প্রকৃত সমাধান নির্দেশ করতে পারেনি। এঁরা পুঁজিবাদের অধীনে মজুরি দাসত্বের আসল প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এমনকি এই পুঁজিবাদী বিকাশের সূত্রগুলিকে ব্যক্ত করতে অথবা কোনো সামাজিক শক্তি যে একটি নতুন সমাজের নির্মাতা হতে পারে, তা দেখাতে পারেননি।'[২] তবে একটা কথা বলা যায় যে, তাঁদের ধ্যানধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধতা ও অপরিপক্বতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের ভূমিকাকে ছোটো করে দেখা যায় না। পুঁজিবাদের জায়গায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্থাপনের কথা তো তাঁরাই বলেছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা বলাটাও ছিল অগ্রগামী চিন্তার দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সমস্ত সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ভাবাদর্শের সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শোষণ ও দারিদ্র্যের

ফলে শ্রমিকের মধ্যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে থেকে তার মধ্যে গড়ে ওঠে আত্মসচেতনতা এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাদের মধ্যে মানবতাবাদী ভাবনা থাকলেও, তাদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা কিছু পরিমাণে আবেগধর্মী ছিল। সেই যুগে অতখানি চিন্তা করাটাও ছিল মানবজাতির মহত্তম মনীষীতুল্য কাজ। ন্যায়পরায়ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার এই যে প্রয়াস, তা বাস্তবে সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে কোনো আপতিক ঘটনা ছিল না।

ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত যদিও পুঁজিবাদের মধ্যে কোনো সংকট দেখা দেয়নি, তবুও শ্রমিকশ্রেণির কর্মস্থলে তাদের উপর নিদারুণ শোষণ, অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের উপর দমনপীড়ন, শ্রমিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা, তাদের মধ্যে কার্যকরী মতাদর্শের অনুপস্থিতি, বুর্জোয়াশ্রেণির 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'-র বাণী থেকে ক্রমেই সরে আসা—এইসব ঘটনা ১৮৩০-৪০-এর দশকে কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন দুটি ছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং চালিকাশক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির অপরিহার্যতা। এমতাবস্থায়, তাই প্রয়োজন ছিল এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এবং তারই ভিত্তিতে গঠিত এক পার্টির। এটাই ইতিহাসের নিয়ম। যখন কোনো-এক বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো সমাজের কাছে প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয় একটা তত্ত্বের, তখনই সেই তত্ত্ব উদ্ভাবনে এগিয়ে আসেন একাধিক চিন্তাবিদেরা। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ছিলেন সেই ধরনেরই দুই চিন্তাবিদ।

টীকা ও তথ্যসূত্র:

১. শোভনলাল দত্তগুপ্ত, *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১।
২. *LCW 19*, p. 27.
৩. শোভনলাল দত্তগুপ্ত: পৃ. ৩৬।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র জন্মকথা

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র অভিমুখে মার্কস ও এঙ্গেলস

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস যথাক্রমে ১৮১৮ ও ১৮২০ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪০-র দশকের শুরুতে উভয়েই জার্মানির বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল: ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মাবলি আবিষ্কার করা; ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা এবং কোন সামাজিক শক্তি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবে, তাকে খুঁজে বের করা। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের নিজেদের রচনায় ও যৌথ-রচনায় *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*-র পূর্বে সেসব তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এইসব রচনায় তাঁরা দার্শনিক হেগেল-এর ধারণার ভাববাদী দর্শনকে গ্রহণ করেননি। হেগেলীয় দর্শন সামাজিক ঘটনাবলির ঐতিহাসিক নিয়মাবলির অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই কাজও উভয়েই আলোচনা করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থে। এইসব গ্রন্থে এবং সে-সময়কার *রাইনিশে সাইটুং*-এ (*Rheinsche Zeitung*—*রাইনিশ সংবাদপত্র*) প্রকাশিত মার্কসের প্রবন্ধমালায় তাঁর সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল।

মার্কস তাঁর 'ডিবেট্স অন্য দ্য ল অন দ্য থেফট্স অব উড' (*রাইনিশে ৎসাইটুং*, ১৮৪২) প্রবন্ধে সামন্তবাদী-রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শ্রেণিগত ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেন এবং 'দরিদ্র, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সম্পদহীন' জনগণের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলি মার্কসের চিন্তাভাবনার এক উত্তরণ-প্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছিল হেগেলীয় ভাববাদ থেকে বস্তুবাদের দিকে, বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদ থেকে সাম্যবাদী মতবাদে। *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*-র প্রস্তুতিকালে মার্কসের রচনায় ছিল *ক্রিটিক অব হেগেল'স ফিলোজফি অব রাইট* (১৮৪৩), *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্টস অব ১৮৪৪*, দ্য পভার্টি অব ফিলোজফি (১৮৪৭) এবং এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত *দ্য হোলি ফ্যামিলি* (১৮৪৫) ও *দ্য জার্মান ইডিওলজি* (১৮৪৫-৪৬)। এঙ্গেলসের লেখা *কন্ডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড* (১৮৪৪-৪৫) গ্রন্থে দেখানো হয়েছিল বিভিন্ন উপায়ে শ্রমিকশ্রেণির উপর পুঁজিপতিদের শোষণ, এবং তিনি এই বইয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা যায় একমাত্র বৈপ্লবিক উপায়ে। *দ্য জার্মান ইডিওলজি* গ্রন্থে তাঁরা বলছেন, 'বিপ্লব প্রয়োজনীয়...শুধু এই কারণে নয় যে, শাসকশ্রেণিকে অন্য কোনোভাবে উৎখাত করা যায়নি। এটা প্রয়োজন এই কারণেও যে, যে-শ্রেণি উৎখাত করছে, সে শুধু এক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নিজেকে যুগ-যুগ ধরে সঞ্চিত আবর্জনা থেকে মুক্ত করতে এবং নতুন করে সমাজ-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।'[১]

এই সময়ে (১৮৪৪) মার্কস আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন: "ক্রিটিকাল মার্জিনাল নোট্স অন দি আর্টিকেল 'দ্য কিং অব প্রুশিয়া অ্যান্ড সোশ্যাল রিফর্ম বাই আ প্রুশিয়ান'"। এই প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'সাধারণত বিপ্লব

হল বিদ্যমান ক্ষমতাকে বাতিল করা এবং পুরোনো সম্পর্কের উচ্ছেদ; অর্থাৎ এক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। কিন্তু বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র অর্জন করা যাবে না। এটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এইদিক থেকে যে, এটার জন্য দরকার ধ্বংসসাধন ও উচ্ছেদ। কিন্তু যেখানে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়, যেখানে সঠিক উদ্দেশ্য, তার লক্ষ্য সামনে চলে আসে, সেখানে সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক ছদ্মবেশটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়।'[২] এইভাবেই মার্কস ও এঙ্গেলস বহু লেখালেখির মধ্যে দিয়ে যৌথভাবে *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*-তে এক বৈপ্লবিক জীবনদর্শনের দলিল রচনা করেছিলেন।

এসবেরই পরিণতিতে *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* রচিত হয়েছিল। তবে ক্ষুদ্র এই গ্রন্থের পরিচিতি দেওয়ার আগে 'সলতে পাকানো'-র পর্যায়টা বা রচনার পূর্ব ইতিহাসটা সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বারা রচিত হয়েছিল ১৮৪৭-৪৮ সালে। উনিশ শতকের সেই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলেছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—যেমন, পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইটালি, জার্মানি প্রভৃতি। পাশাপাশি চলেছিল শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনও। এইরকম এক পরিস্থিতিতে জার্মানির স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শাস্তিস্বরূপ একদল ব্যক্তিকে জার্মানি থেকে প্যারিসে নির্বাসিত করা হল। সেখানে ১৮৩৪ সালে তাঁরা এক গোপন সংগঠন তৈরি করলেন। নাম দিলেন 'লিগ অব এক্সাইল্‌স'। এর সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গণতান্ত্রিক এবং লক্ষ্য ছিল প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৮৩৬ সালে এই সংগঠনের মধ্যে এক বিভাজন ঘটে। বামপন্থী সদস্যরা আলাদা হয়ে ন্যায়নিষ্ঠদের লীগ (ফেডারেশন অব দ্য জাস্ট) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও